



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 517 - 523

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্রনাথের শিশু ভোলানাথ : শিশু সাহিত্যের অনন্য সোপান

পার্থ সারথি চক্রবর্তী

Email ID: sarathiparthach@gmail.com

ID 0009-0009-9781-3887

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Childhood
imagination,
Nature and
innocence,
Mother-child
relationship,
Freedom and play.

Abstract

In this essay, I discuss Rabindranath Tagore's contribution to Bengali children's literature through his poetry collection Shishu Bholanath. I believe that Tagore did not write about children from an adult point of view; rather, he entered the child's mental world and wrote from within it. I see childhood as a special stage of life full of imagination, emotion, curiosity, and freedom, and Tagore's poems beautifully reflect this understanding.

I focus especially on the role of imagination in a child's life. In Shishu Bholanath, I find that nature — rivers, rain, birds, trees, and open fields — becomes a part of the child's emotional world. Nature is not just background scenery; it actively shapes the child's joy, playfulness, and sense of wonder. I notice that Tagore's simple language and gentle rhythm match the natural way children think and feel.

I also examine the mother-child relationship in these poems. I observe that the mother represents care, safety, and emotional comfort. The child expresses love, dependence, complaints, and affection freely toward the mother. Through this relationship, I understand how Tagore reveals the emotional depth of childhood.

Another important idea I highlight is freedom. I find that children in Shishu Bholanath wish to escape strict rules, school discipline, and social control. They long to run, play, dream, and explore the world without restrictions. I interpret this as Tagore's belief that creativity and emotional growth cannot flourish under rigid discipline.

I further argue that Tagore's children are realistic, not idealized. They are playful, emotional, sometimes naughty, and sometimes confused — just like real children. This realism, I believe, gives psychological depth and social relevance to the poems.

Finally, I conclude that Shishu Bholanath is not only children's literature but also literature for adults. It helps us understand childhood more deeply and allows us to reflect on freedom, creativity, nature, and human emotions through the eyes of a child.

Discussion

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারা জীবন ধরে শৈশবস্মৃতিতে আগ্নুত থাকতেন। তাঁর কল্পনায়, প্রকৃতিতে এবং ঠাকুরবাড়ির নানা শিশুর সংস্পর্শে তিনি মুগ্ধ ছিলেন। তাই তাঁর ছোটগল্প, নাটক, কবিতায় শিশুদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অল্প বয়সে তিনি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পরিচালনায় প্রকাশিত ‘বালক’ পত্রিকায় লেখার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এর ফলে ছোটদের জন্য তাঁর লেখা নানা ছড়া, কবিতা এবং গল্পের প্রকাশ পেতে থাকলো। আবার তাঁর কাব্য রচনার অন্যতম সহায় হল শৈশবের ভুবনভাঙা। শান্তিনিকেতনে বাবার সাথে কিছুদিন থাকার সূত্রে সেখানকার মাঠ, গ্রাম, প্রকৃতিকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন - তাঁর বহিঃপ্রকাশ ‘প্রভাতসঙ্গীত’ কাব্যে ফুটে উঠলো। শান্তিনিকেতনের এই শান্ত পরিবেশ তাঁর কাব্যরচনার সহায় হল। আবার এখানের ছোট নারকেল গাছের তলায় বসে বালক রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘পৃথীরাজ পরাজয়’ নামক নাট্যকাব্য। এরপর কবির বয়স যখন সতেরো, তখন তিনি গিয়েছিলেন বিলাত। বিলাত যাবার আগে আমেদাবাদের শাহীবাগে দাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে মোঘল যুগের নির্জন অট্টালিকায় অবস্থানকালে কবির মনে নানা কল্পনার সৃষ্টি হয়। তারই প্রকাশ ‘ক্ষুধিত পাষণ’, ‘মনিহারা’ ইত্যাদি গল্পে পাওয়া যায়। আবার রবীন্দ্রনাথের শৈশবচেতনাকে বুঝতে গেলে তাঁর বিশাল পরিবারে ঝি-চাকরদের অধীনে বড়ো হয়ে ওঠাটাও জানতে হবে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বারোটি সন্তানের একজন হলেন রবীন্দ্রনাথ, মা সারদা দেবীর যত্ন না পাওয়ায় ভৃত্যদের অধীনই তাঁকে দিন কাটাতে হত অনাদরে। সেই ভাবনার প্রকাশ ‘ডাকঘরে’র মতো গল্পে দখা যায়। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

“শাহীবাগে জজের বাসা। ইহা বাদশাহী আমলের প্রাসাদ, বাদশাহের জন্যই নির্মিত। এই প্রাসাদের প্রকারপাদমূলে গ্রীষ্মকালের ক্ষীণস্বচ্ছ সাবরমতী নদী তাহার বালুশয্যার এক প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদী তীরের দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগে একটি প্রকান্ত খোলাছাদ। মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন। প্রকান্ত বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেহ থাকিত না- শব্দের মধ্যে কেবল পায়রাগুলির মধ্যাহ্নকুজন শোনা যাইত। তখন আমি যেন একটা অকারন কৌতূহলে শূন্য ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একটি বড়ো ঘরের দেওয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বইগুলি সাজানো ছিল। তাহার মধ্যে বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা, অনেক ছবিওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল।”

রবীন্দ্রনাথের শিশুচেতনার প্রকাশ আমরা বিভিন্ন রচনায় পাই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘শিশু’, ‘শিশু ভোলানাথ’ এর মতো কাব্য। ‘শৈশব সংগীত’ কাব্যে তাঁর যে শিশুভাবনার প্রকাশ ঘটেছিল, তারই যেন রূপান্তর এই দুই কাব্যে পরবর্তীকালে পাওয়া যায়। তবে ‘শিশু’র চেয়ে ‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যটি শিশুহৃদয়ের আরো কাছাকাছি অবস্থিত। ১৯০২-তে কবিপত্নী মুনালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। এরপর তিনি ১৯০৩ এ অসুস্থ মধ্যম কন্যা রেনুকা এবং কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রকে নিয়ে আলমোড়ায় যান বায়ু পরিবর্তনের জন্য। সেখানে তাদের মনোরঞ্জননের জন্য তিনি ‘শিশু’ কাব্যের অনেক কবিতা রচনা করেন। এরপর নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁদের কবি হারিয়েছেন অচিরেই, শুধু তাই নয় ১৯১৮ সালে জ্যোষ্ঠা কন্যা বেলারও মৃত্যু ঘটেছে। এই মানসিক পরিস্থিতিতে ১৯২২ সালে কবি লিখলেন ‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্য।

এই ‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যে মোট ২৭টি কবিতা আছে। কবিতাগুলিতে শিশুমনস্কতার ছাপ রয়েছে। কবিতাগুলি খুবই মধুর। তাই এটি একেবারে নতুন স্বাদের কবিতার বই। তবে কাব্যটি রচনার অন্য প্রেক্ষাপটও ছিল। কবি সেই সময় শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর কাজ নিয়ে প্রায় তিনমাস ছিলেন। তখন পাঠ্যভবনে শিশুদের সাথে তাঁর সখ্যতাও গড়ে ওঠে। ইতিপূর্বে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তখন তিনি দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সংবর্ধনা পাচ্ছেন এবং বক্তৃতা দিচ্ছেন। সেই সময় দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও জটিল হয়ে গিয়েছিল। কবি সেই সময় রাজনৈতিক ভাবনা থেকে নিজেকে সরিয়ে বিশ্বসংস্কৃতির সাথে আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে মেলাতে উদ্যোগী হলেন। তাই তিনি শান্তিনিকেতনকে সর্বমানবের মিলনতীর্থ করার প্রয়াসী হলেন। এই মনোবাসনাকে সফল করার জন্য তিনি আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করতে থাকলেন। কিন্তু সমস্যা হল কবি দীর্ঘ সময়ে না লেখেন কোন কবিতা না লেখেন কোন গান। দেশে ফেরার বহুকাল পরে তিনি ‘বর্ষামঙ্গলের’ জন্য কয়েকটি গান লিখলেন। তারপর তিনি ‘শিশু ভোলানাথ’ এর কবিতা লিখতে শুরু করলেন। শিশুদের জন্য লেখার কারন হল বয়স্ক লোকেদের দায়িত্ববোধ

জীবনকে ক্ষনকালের জন্য কবি মন থেকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাই তিনি শিশুদের জন্য লিখলেন ‘শিশু ভোলানাথ’। উক্ত কাব্যে তাই কবির বহু দিনের হারিয়ে যাওয়া শিশু মনের সন্ধান আমরা পাই—

“কিছুকালের জন্য আমি এই বস্তু-উদ্গারের অক্ষয়জ্বের মুখে এই বস্তু সঞ্চয়ের অক্ষভাণ্ডারে বন্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাস্পে শ্বাস রুদ্ধ প্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলাম। ... আমেরিকার বস্তু গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই [৪ মাস পরে] ‘শিশু ভোলানাথ’ লিখতে বসেছিলাম। ... দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিন্তের জন্যে এত বড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীনের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলাম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোক-লোকান্তরে বিস্তৃত। এই জন্যে কল্পনায় সেই শীশুলীলার মধ্যে ডুব দিলাম, সেই শিশু-লীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলাম, মনটাকে ম্লিঙ্ক করার কন্যে, নির্মল করার জন্যে, মুক্ত করার জন্যে।”^২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তিনি বারবার দূর থেকে শিশুকে দেখেছেন, শিশুদের সাথে বিচ্ছেদবোধে ব্যথিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাদের ফিরে পাবার জন্য তৃষিতও হয়েছেন। সেই ভাবনার প্রকাশ ‘শিশু ভোলানাথ’ এ ফুটে উঠেছে। তবে এই কাব্যের কবিতাগুলি শিশুদের জন্য লেখা হলেও পরিণত বয়স্কদের মনোজগতেও প্রবেশ করেছে। কবিতাগুলিতে শিশুর শৈশব, তাদের স্বপ্ন, স্কুলের জীবন, পণ্ডিতমশাই, বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা, খেলার জন্য খোলা মাঠ, রাজা ও রানী প্রভৃতি নানা বিষয়ে লেখা। কাব্যটিতে শিশু-কল্পনা আরো গভীর হৃদয় দিয়ে কবি বিশ্লেষণ করেছেন। শিশুর ভিতরের একটা অন্তর্মুখিতার ভাবনাও এখানে আছে।

প্রথমেই ‘তালগাছ’ নামক শিশুপাঠ্য উপযোগী একটি সুন্দর কবিতার কথা বলবো। কবিতাটি আয়তনে ছোট। কিন্তু সুন্দর এক দৃশ্যকল্প কবিতায় আছে। লম্বা তালগাছ যেন একপায়ে দাঁড়িয়ে আকাশে উঁকি মারছে। যখন হাওয়া বইছে, তখন তার মনে সাধ হয় কালো মেঘ ফুঁড়ে আকাশে উরে যাবে। কিন্তু সেই ওড়ার জন্য তো তার পাখা নেই। পাখা থাকলে সে ঠিক উড়ে যেত। শেষে হাওয়া থেমে গেলে তার পৃথিবীর কোণটিই ভালো লাগে—

“তারপরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি
যেইভাবে মা যে হয় মাটি তার,
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি”। (‘তালগাছ’)

এখানে কবি তালগাছকে কেন্দ্র করে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, কল্পনা এবং মানুষের মনোভাব প্রকাশ করেছেন। শিশুর কল্পনার মতই তালগাছেরও প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তির জন্য আকাশে উড়তে চায়, অথচ তার শিকড় মাটির গাঁথা। কবিতাটি শিশু মনস্তত্ত্বের কবিতা হলেও এক গভীর মানবিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাটি থেকে আমরা জানতে পারি বড়ো স্বপ্ন দেখা ভালো, কিন্তু নিজের অবস্থাকেও মূল্য দিতে জানতে হবে। আবার ‘রবিবার’ কবিতায় শিশুদের সহজ সরল মনের কল্পনা ও অনুভূতি ফুটে উঠেছে। কবিতাটিতে একটি শিশুর মুখ থেকে রবিবারের বিশেষত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এই রবিবারের অপেক্ষায় শিশুরা সবসময় থাকে। কারন ঐ দিন তারা পাঠ্যপুস্তক ও স্কুলের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে। শিশু তাই জিজ্ঞাসা করে সোম, মঙ্গল, বুধ খুব দ্রুত আসে, কিন্তু রবিবার আসতে এত দেরী করে কেন? সে ভাবে রবিবার বুঝি তার মায়ের মতো ‘গরিব ঘরের মেয়ে’। এখানে কবি মাতৃত্বের স্নেহ ও ভালোবাসাকে শিশুর অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাই বারবার উক্ত চরনটি কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতার শেষে রবিবার অতিক্রান্ত হওয়ার বেদনা শিশুমনকে ব্যথিত করেছে।

“কিন্তু শনির রাতের শেষে
যেমনি উঠি জেগে,
রবিবারের মুখে দেখি

হাসিই আছে লেগে।

যাবার বেলায় যায় সে কেঁদে

মোদের মুখে চেয়ে।

সে বুঝি মা, তোমার মত

গরিব ঘরের মেয়ে?” (‘রবিবার’)

রবিবার শিশুদের কাছে শুধু ছুটির দিন নয়, শিশুমনের আনন্দের দিন। শিশুদের মুক্তির প্রতীক হল এই রবিবার। আবার ষাটোর্ধ রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশু হৃদয় নিয়ে লিখলেন ‘সময়হারা’র মতো কবিতা। প্রতিটি শিশু বাস্তবিক সময়ের নিয়ম কানুন ও চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করার কল্পনা করে। শিশুটি ভাবে সময়কে যদি চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে স্কুল যাওয়া, পড়ার চাপ, বড়দের শাসন সব শেষ হবে। আলোচ্য কবিতার শিশুটি কল্পনার পাখায় ভর করে সকলকে নজের মতো করে চালাতে চায়—

“যত ঘন্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত

শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,

তখন স্কুলে নাই বা গেলেম, কেউ যদি কয় মন্দ,

আমি বলব, ‘দশটা বাজাই বন্ধ’।

তাধিন, তাধিন, তাধিন”। (‘সময়হারা’)

‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যে কবি মাকে নিয়েই বেশিরভাগ কবিতা লিখেছেন। যেমন— ‘পুতুল ভাঙা’, ‘মনেপড়া’, ‘সাত সমুদ্র পারে’, ‘মুখু’, ‘খেলা ভোলা’, ‘পথহারা’, ‘বানী বিনিময়’, ‘অন্যমা’, ‘সুয়োরানী’ প্রভৃতি। আসলে রবীন্দ্রনাথ খুব শৈশবেই মাতৃহারা হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে ভৃত্যদের অধীনে মানুষ হতেন। তাই মায়ের সঙ্গে সময় কাটানোর অভিজ্ঞতা কম। সেজন্য তিনি মাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আলোচ্য কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন। যেমন - ‘মনেপড়া’ কবিতার কথা প্রথমে বলা যায়। কবিতায় শিশুটি বলেছে তার মাকে আর সরাসরি মনে পড়ে না। কিন্তু তার খেলার ছন্দে, তার গানের সুরে কিংবা দুর্গাপূজার সময়ের প্রকৃতির মাঝে সে মাকে অনুভব করে—

“মাকে আমার পড়ে না মনে।

শুধু যখন আশ্বিনেতে

ভোরে শিউলি বনে

শিশিরভেজা হাওয়া বেয়ে

ফুলের গন্ধ আসে,

তখন কেন মায়ের কথা

আমার মনে ভাসে”। (‘মনেপড়া’)

কবিতাটিতে মায়ের জৈবিক স্মৃতি শিশুটির কাছে স্পষ্ট না হলেও চেতনায় এবং জীবনের নানা মুহূর্তে মায়ের অনুভূতি ফিরে আসে। আবার ‘পুতুল ভাঙা’ কবিতায় কন্যার নালিশ স করুন হয়ে উঠেছে মায়ের কাছে। কবিতায় দেখা যায় একটি ছোট্ট মেয়ে সে তার মায়ের কাছে অভিমান করে বলেছিল যে সে নামতা ভুল বলায় গুরুমশাই তার মায়ের রথের সময় কিনে দেওয়া রঙিন পুতুলটি ভেঙে দেয়—

“মাগো, তুমি পাঁচ পয়সায়

এবার রথের দিনে

সেই যে রঙিন পুতুল খানি

আপনি দিলে কিনে

খাতার নীচে ছিল ঢাকা,

দেখলে এক ছেলে,

গুরুমশাই রেগেমেগে

ভেঙে দিলেন ফেলে”। (‘পুতুল ভাঙা’)

এরপর সে ভাবে গুরুমশাইয়ের কি কোন পুতুল ছিল না এবং সেটি কেউ ভেঙে দিলে তিনি তো দুঃখ পেতেন। কবিতাটিতে শিশুদের চাহিদা, অনুভূতি ও নানা বেদনাকে কবি মননশীল ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার মা-ই যে শিশুর আসল সমব্যাপী সেটাও কবি বুঝিয়েছেন। শিশুর নির্মল কল্পনা, জিগ্যাসা ও স্বাধীনতার অভিব্যক্তি ঘটেছে ‘সাত সমুদ্রের পাড়ে’ কবিতায়। কবিতায় শিশুটি সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দেবার কল্পনা করেছে। তাই সে মায়ের কাছে বাবার খাতার পাতা ছিঁড়ে নৌকা বানিয়ে দিতে বলে এবং মায়ের ছবিও আঁকিয়ে নিতে চায়—

“কাগজ ছিঁড়ে এনেছি এই

বাবার খাতা থেকে

নৌকা দে-না বানিয়ে, অমনি

দিস, মা, ছবি এঁকে”। (‘সাত সমুদ্র পারে’)

আসলে আজানাকে জানার যে ভাবনা শিশুদের মনে থাকে তাই কবি এখানে প্রকাশ করেছেন।

শিশুদের জগৎ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ধরনের কবিতা লিখেছেন। আর মাকে নিয়ে তার ভাবনার বৈচিত্র্য ‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যে আরো নানাভাবে এসেছে। তিনি নিজের শৈশবের আনন্দ বা বেদনাকে কবিতার মধ্য দিয়ে সর্বজনীন করে তুলেছেন। কবির ‘খেলাভোলা’ কবিতাটিতে একটি শিশুর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তুলে ধরেছেন। কবিতায় দেখা যায় শিশুটি তার মাকে জানায় যে মাকে কিভাবে শিশুটি সবসময় খেলতে চায়। কিন্তু শিশুটি কি খেলবে তা ভাবতে ভাবতেই সময় চলে যায়। প্রকৃতির নানা দৃশ্য শিশুটিকে প্রকৃতির জগতে নিয়ে যায়। কবিতার শেষে মাকে উদ্দেশ্য করে বলে---

“অনেক দূরের মা।

কাছে গিয়ে হাতখানি ছুঁই

হারিয়ে ফেলা মা যেন তুই,

মাঠ পাড়ে কোন বটের তলার

বাঁশির সুরের মা”। (‘খেলা ভোলা’)

অর্থাৎ মায়ের প্রতি গভীর অনুভূতি ফুটে উঠেছে। কবিতাটিতে শিশুমনের অস্থিরতা, কল্পনা ও মায়ের প্রতি নির্ভরতা লক্ষ করা যায়। আবার ‘পথহারা’ কবিতায় আমরা দেখি এক শিশু মাকে কিছু না বলে দূরে বনে চলে যায়। তারপর ওই বনের মধ্যে শত অজানা ভয়ের ব্যাপার ঘটে। এইসব দেখে শিশুটি ভয়ও পায়। তারপর সে বলে—

“বল দেখি তুই, কেমন করে

ফিরে পেলেম মাকে”। (‘পথহারা’)

আসলে শিশুটি স্বপ্নে এইসব ভাবছিল। কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে শিশুরা চায় নিয়মের গন্ডি পেড়িয়ে কোন অজানা পথে হাঁটতে। তাই পথ হারানোর অর্থ হল খুঁজে পাওয়া নতুন পথ। আবার ‘অন্যমা’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এক শিশুর ভাবনাকে কল্পনা করেছেন যে তার জন্মদাত্রী মা যদি তার মা না হয়ে অন্য কারোর মা হত। কবিতাটিতে একটি নদী ও তার দুই পাড়ে দুই বাড়ির ইঙ্গিত আছে। শিশু ভাবে বাড়ি আলাদা হলেও খেলার শেষে মায়ের কাছেই যেত—

“এই খানেতেই দিনের বেলা

যা কিছু সব হত খেলা

দিন ফুরোলেই তোমার কাছে

পেরিয়ে যেতেম নায়ে”। (‘অন্যমা’)

কবিতায় মা ও সন্তানের সম্পর্ক যে চিরন্তন, যা কোন বাঁধার কাছেই টেকে না - তা বোঝানো হয়েছে। এইভাবে ‘শিশু ভোলানাথ’র আরো অনেক কবিতায় কবি মায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

‘শিশু ভোলানাথ’ এ ‘দুষ্ট’ অথবা ‘মুখু’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের শিশুরা অভিমাত্রী। অভিভাবকের কাছে শিশুরা একটুও প্রশংসা পায় না। যেমন ‘দুষ্ট’ কবিতায় শিশুটি অভিযোগ করে জানায়—

“তোমার কাছে আমিই দুষ্ট
ভালো যে আর সবাই।
মিত্রদের কালু নীলু
ভারি ঠান্ডা ক- ভাই।
যতীশ ভালো, সতীশ ভালো,
ন্যাড়া নবীন ভালো,
তুমি বল ওরাই কেমন,
ঘর করে রয় আলো”। (‘দুষ্ট’)

শিশুটি তার শৈশবের সারল্য ও চঞ্চলতা প্রকাশ করেছে, সে খেলা, মজা, পড়াশোনায় ফাঁকি, জামাকাপড় নোংড়া করা, বৃষ্টিতে ভেজা এসব করেই দুষ্টমি করে। মাস্টারমশাই নানা অভিযোগ করলে মায়ের শুনতে ভালো লাগে না। কিন্তু কবিতার শেষে শিশুটি বারবার প্রসঙ্গ এনে বলে বাবা একটু ও দুষ্টমি করেনি? এই ভাবনায় কবিতাটি অন্যমাত্রা পেয়েছে। অন্যদিকে ‘মুখু’ কবিতাটিতে শিশুটি মুখু হয়েই থাকতে চায়। কারন যারা মুখু তাদের সবসময় ছুটি থাকে। যারা রাখাল, যারা পড়াশোনা ভুলে মাঠে ঘোরে, যারা বৃষ্টিতে ভেজে, যারা বই পড়ে না, যারা বাদলা মেঘের পাড়ায় পালিয়ে যায়— আলোচ্য কবিতায় শিশুটি সেই দলেই থাকে। এই মুখু হয়ে থাকায় তার মা যদি তাকে আদর নাও করে তাতেও শিশুটির অসুবিধা নেই, কারন সে পালিয়ে যাবে। কবিতাটিতে কবি কৃত্রিমতা ভরা সমাজব্যবস্থার বাইরে শিশুর স্বভাবগত স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যান্য অনেক কবিতার মতোই এখানেও মা ও সন্তানের সংলাপের মধ্য দিয়ে কবিতাটি উপস্থাপিত হয়েছে। মা ও সন্তানের বানী বিনিময় এবং স্নেহ মিলনের অপূর্ব দৃশ্য ‘বানী বিনিময়’ কবিতাতেও দেখা যায়।

‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যের শিশুরা মাতৃভক্ত। মায়ের কাছেই তাদের নানা অভিযোগ, আবার মা’ই হল তাদের পৃথিবী। এই শিশুরা প্রকৃতির পাঠশালায় বেড়ে ওঠে। রোদ, বৃষ্টি, নদী, গাছ, মাটি প্রভৃতি প্রকৃতির নানা উপকরণের সঙ্গে তাদের জীবন জড়িয়ে থাকে। যেমন - ‘ইচ্ছামতী’ কবিতায় শিশুর নদী হতে চাওয়ার অকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভাবনার মূল বিশেষত্ব হল শিশুর মনের কল্পনা ও ইচ্ছাশক্তির গুরুত্ব দেওয়া। কবি ইচ্ছামতী নদীর রূপ, পাড়ের জীবন, মাছ ধরা, কিশোরদের মজা - এসব চিত্রিত করেছেন। নদীর মাধ্যমে কবি শৈশব, প্রকৃতি ও মানব জীবনের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। ‘দূর’ কবিতাটি কেবল দূরের ভ্রমণযাত্রার কবিতা নয়, মায়ের কোলে ফিরে আসার কবিতা। এই কাব্যে ‘বাউল’ নামক একটি দীর্ঘ কবিতা আছে। বাউলের জীবনের সঙ্গে শিশুর মনোবেদনাকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। শিশুটি সমস্ত বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে একতারা নিয়ে দূরের দেশে চলে যেতে চায়—

“তোমার একতারা পাঠশালায়,
আমায় ভুলিয়ে দিতে পার?
নেবে আমায় সাথে?” (‘বাউল’)

কবিতায় বাউল শুধু লোকশিল্পী নয়, সে উদারতা, মুক্ত আত্মার প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাই কবি পালিয়ে যেতে চেয়েছেন ঘর ছাড়াদের দলে। এখানে প্রথাবদ্ধ জীবনের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। ‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যের প্রথম কবিতার কথা বলে আলোচনা শেষ করবো। কবিতাটির নামই হল ‘শিশু ভোলানাথ’। এই কবিতাটিতে একটি মুক্ত, নির্মল, স্বতঃস্ফূর্ত শিশুর প্রাণ ও তার খেলার জগৎকে কেন্দ্র করে কবি ইচ্ছাশক্তি, কল্পনা ও ধ্বংসমুক্ত সৃষ্টিশীলতাকে উদ্ভাসিত করেছেন। শিশুটি কারো শাসন মানে না, কোন বাঁধার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করতে চায় না। সে প্রতিটি খেলনা ভেঙে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে চায়। কবিতাটিতে কবি শিশুকে কেন্দ্র করে সৃষ্টিশীলতার অবসানহীন ছন্দ, নিরাভরণ প্রাণ ও মুক্তির অনন্দের ধারেকা বিশ্বসুলভ দর্শনে রূপান্তরিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যে শিশুর মনোজগৎ, তার ভাবনা, মা-শিশুর স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক ও শিশুর কল্পনাশক্তি ছন্দময় ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে শিশুদের মনের সরলতাকে অনুধাবন করেছেন। এই কাব্যের কবিতাগুলিতে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ যেমন আছে, তেমনি শিশুমনের বিচিত্র ইচ্ছা ও অসম্ভব কল্পনাশক্তির প্রকাশও লক্ষ করা যায়। তবে বেশীরভাগ কবিতায় মায়ের উপস্থিতি রয়েছে, যেখানে শিশুর সাথে মায়ের সম্পর্ক ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় হালকা চালে, হালকা সুরে ও হালকা ছন্দে লেখা। তবে শিশুমনস্তত্ত্বের আড়ালে গভীর ও অতলম্পর্শী জীবনের কথাই কবি বলেছেন। তাই ‘শিশু ভোলানাথ’ শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বিশ্ব সাহিত্যেরও শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বিবেচিত।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী, কার্তিক ১৪২৪, কোলকাতা ১৭, পৃ. ৯৪
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, কামিনী প্রকাশালয়, চতুর্থ সংস্করণ, মে ২০১১, ৫ নবীনচন্দ্র পাল লেন, কোলকাতা ০৯, পৃ. ৭৪০-৭৪১

Bibliography:

- মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার, রবীন্দ্র জীবনী, বিশ্বভারতী, তৃতীয় খন্ড, ৬ আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র রোড, কোলকাতা ১৭, পঞ্চম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, কামিনী প্রকাশালয়, চতুর্থ সংস্করণ, মে ২০১১, ৫ নবীন চন্দ্র পাল লেন, কোলকাতা ০৯
- মজুমদার, লীলা, রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য (কাব্য), পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, কোলকাতা, ১৩৯৬
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী, কার্তিক ১৪২৪, কোলকাতা ১৭